তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থান

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

তীর্থস্থান পবিত্র স্থান। বৌদ্ধধর্মে অনেক তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র পুণ্যভূমি। বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও দর্শনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধরা তীর্থ স্থান ভ্রমণে যায়। বৌদ্ধধর্মে তীর্থস্থান ভ্রমণে পুণ্যফল লাভের কথা বলা হয়েছে। এ সকল পবিত্র স্থানগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– তীর্থ ও মহাতীর্থ। বুদ্ধের জীবনে নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে 'বৌদ্ধ তীর্থস্থান' বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এ সকল স্থানকে 'তীর্থ' বলা হয়। যেমন, কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগৃহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। অন্যদিকে বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে 'মহাতীর্থ' বলা হয়। যেমন- লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর। এছাড়াও বৌদ্ধদের অনেক ইতিহাসসমৃদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ	
পাঠ -১৩.১ : তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের ধারণা পাঠ -১৩.২ : তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব পাঠ -১৩.৩ : লুম্বিনী পাঠ -১৩.৪ : বুদ্ধগয়া পাঠ -১৩.৫ : সারনাথ পাঠ -১৩.৬ : পাহাড়পুর পাঠ -১৩.৭ : ময়নামতি	বুদ্ধের জীবনে নানা ঘটনাবহুল পবিত্র স্থানসমূহকে বৌদ্ধ 'তীর্থস্থান' বলা হয়। বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে জড়িয়ে আছে। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তূপ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে এ সকল স্থানকে 'তীর্থ' বলা হয়। যেমন- কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, লুম্বিনী, বৈশালী, রাজগৃহ, চক্রশালা, মহামুনি, রামকোট প্রভৃতি। বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি বিজড়িত পবিত্র স্থানগুলোকে 'মহাতীর্থ' বলা হয়। এছাড়া বৌদ্ধদের ইতিহাসসমৃদ্ধ বহু ঐতিহাসিক স্থানও আছে।

পাঠ-১৩.১ তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের ধারণা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- বৌদ্ধ তীর্থস্থান সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	তীর্থ, মহাতীর্থ, পুর্ণ্যস্থান, তীর্থভ্রমণ, ঐতিহাসিক নিদর্শন, অষ্টমহাতীর্থস্থান, গৌরবময়কীর্তি, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

তীর্থস্থান

'তীর্থ' শব্দের অর্থ হল 'পুণ্যস্থান'। সুতরাং যে স্থান দর্শন করলে পুণ্য অর্জন হয়, তাকে 'তীর্থস্থান' বলে। ভগবান বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকে বৌদ্ধ 'তীর্থস্থান' বলা হয়। সেরকম কয়েকটি তীর্থস্থান হল: কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, কৌশাম্বী ইত্যাদি। তীর্থস্থানগুলো হল পবিত্রস্থান, পুণ্যস্থান, পুণ্যক্ষেত্র। ধর্মপালনের মত তীর্থদর্শনও গুরুত্বপূর্ণ। তীর্থদর্শনে মনের পাপ দূরীভূত হয়। চিত্তশুদ্ধি ও মনের শুচিতার জন্য তীর্থদর্শন উত্তম। এতে পুণ্য সঞ্চয় হয়, মন পবিত্র হয়। জীবনে আসে পরম শান্তি। তীর্থস্থানে নানা দেশের লোকেরা এসে জড়ো হয়। তাদের সাথে মেলামেশা ও ভাব বিনিময় হয়। মনের প্রসারতা বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধ যেসব স্থানে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেছেন, সেসব স্থান তাঁর জীবিতকালে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে। এগুলো পবিত্র তীর্থস্থানরূপে বিবেচিত।

মহাতীর্থ স্থান

মহাপরিনির্বাণ সূত্রে ভগবান বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন;-'চারটি স্থান শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিদের পরিদর্শন করা উচিত। এতে তাঁদের শ্রদ্ধা ও ধর্ম প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ঐ চারটি স্থান হল: লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর। বুদ্ধ লুম্বিনীতে জন্ম করেন, বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সারনাথে প্রথম ধর্মপ্রচার করেন এবং কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। ভগবান বুদ্ধের উক্ত চারটি মহৎ ঘটনা এ চারটি স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। তাই এ চারটি স্থানকে 'মহাতীর্থস্থান' বলা হয়। বুদ্ধ জীবনের বিশেষ ঘটনাবলির জন্য আরো চারটি স্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানগুলো হলো- রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী এবং সাংকাশ্য নগর। উপরি-উক্ত আটটি স্থান বৌদ্ধধর্মে 'অষ্টমহাতীর্থস্থান' নামে পরিচিত। বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলো বৌদ্ধদের নিকট অতি পবিত্র পুণ্যভূমি। ঐতিহ্যমণ্ডিত স্মৃতিবহ এ সকল স্থানে বিহার, চৈত্য, স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক স্থান

বৌদ্ধদের অনেক ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে। ঐতিহাসিক স্থানসমূহও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য, বৌদ্ধ রাজন্যবর্গ কিংবা প্রাচীন সভ্যতা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শনসম্পন্ন স্থানকে ঐতিহাসিক স্থান বলা হয়। যেমন- গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থান হল অতীতের বৌদ্ধ রাজা-মহারাজা বা স্বনামধন্য মহাপুরুষের রেখে যাওয়া কীর্তি। এসব কীর্তি কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে যায়। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকরা আবার তা আবিষ্কার করেন। বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে: যেমন- মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি প্রভৃতি।

বৌদ্ধ তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানগুলো ভারত-বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্যে অত্যন্ত গৌরবময় কীর্তি। এ সব স্থানসমূহ বৌদ্ধ সভ্যতা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির পীঠস্থানও বটে।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর স্মৃতি বিজড়িত স্থান সমূহকে 'তীর্থস্থান' বলা হয়। যেমন; কপিলাবস্তু, শ্রাবস্তী, বৈশালী, রাজগৃহ, কুশীনগর ইত্যাদি। চিত্তশুদ্ধি ও মনের শুচিতার জন্য তীর্থস্থান দর্শন করা উত্তম মঙ্গল। তীর্থস্থান হল পবিত্রস্থান ও পুণ্যক্ষেত্র। বুদ্ধ লুম্বিনীতে জন্মগ্রহণ করেন, বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন, সারনাথে প্রথম ধর্ম প্রচার করেন এবং কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাই এ চারটি স্থানকে 'মহাতীর্থ' বলা হয়। রাজগৃহ, বৈশালী, শ্রাবস্তী এবং

সাংকাশ্য নগরও মহাতীর্থ বলে কথিত। তাই এগুলো 'অষ্টমহাতীর্থ' স্থান নামে অভিহিত। বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক স্থানসমূহও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ। যেমন; গান্ধার, মথুরা, সাঁচি, অজন্তা, ইলোরা, তক্ষশীলা, নালন্দা প্রভৃতি। ঐতিহাসিক স্থানসমূহ কালের আবর্তে ধ্বংস হয়ে হারিয়ে গেছে। পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিকেরা সেগুলোর ধ্বংসস্তূপ আবিষ্কার করেন। পবিত্র তীর্থস্থানগুলো প্রত্যেকের দর্শন করা একান্ত কর্তব্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১নং প্রশ্নের উত্তর দিন?

মানসী বড়ুয়া বৌদ্ধ তীর্থ, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান দর্শনের জন্য ভারতে গিয়েছিলেন। তিনি সর্ব প্রথম বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের স্থানে গিয়ে বন্দনা করে কিছুক্ষণ ধ্যানে রত থাকেন। পরবর্তীতে অন্যান্য তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ ক্রমান্বয়ে দর্শন করেন।

১. মানসী সর্বপ্রথম বৌদ্ধ তীর্থস্থান দর্শন করেন–

i. সারনাথ ii. লুম্বিনী

iii. বুদ্ধগয়া

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i ও ii খ. i

গ. iii ঘ. i ও iii

২. কোনটি বৌদ্ধ মহাতীর্থ স্থানের অন্তর্গত?

ক. মথুরা খ. ইলোরা

গ. তক্ষশীলা ঘ. বুদ্ধগয়া

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ঘ

পাঠ-১৩.২ তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বৌদ্ধ নিদর্শন, সঙ্ঘারাম, বিহার, চৈত্য, স্তম্ভ, পাহাড়পুর, ময়নামতী, মহাস্থানগড়, শ্রাবস্তী, কৌশম্বী, তক্ষশিলা, প্রন্নতা ও ঐতিহ্যবোধ।

তীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানের সংজ্ঞা

বৌদ্ধধর্ম সুপ্রাচীন ধর্ম। যার প্রবর্তক গৌতম বুদ্ধ। তিনি বুদ্ধত্ব লাভের পর থেকে মহাপরিনির্বাণ লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। ধর্ম প্রচারের জন্য বুদ্ধ অনেক জায়গা পারি ভ্রমণ করেন। তাঁর আদেশে শিষ্য ও প্রশিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। সেই সব জায়গায় পরবর্তীতে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে সঙ্ঘারাম, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা কিংবা স্মৃতি এসব স্থানে ছড়িয়ে আছে। এজন্য এসব স্থানকে বলা হয় তীর্থ। অন্যদিকে বৌদ্ধদের নানা কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ইতিহাস সেখানে জড়িত সেগুলো হলো ঐতিহাসকি স্থান। ঐ সকল ঐতিহাসিক স্থানে বুদ্ধ, বুদ্ধ শিষ্য-প্রশিষ্য, রাজন্যবর্গ, শ্রেষ্ঠী ঘিবো প্রাচীন স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নানার নিদর্শন পাওয়া যায়। যেমন– কপিলাবস্তু, ইসিপতন-মৃগদাব, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, গৃধ্রকূট পর্বত, কৌশম্বী।

বাংলাদেশ ও ভারতের অনেক জায়গায় এরকম ঐতিহাসিক স্থান আছে। সেগুলোর মধ্যে অজন্তা, ইলোরা, বিক্রমশীলা, তক্ষশিলা, পুরুষপুর, সীতাকোট বিহার, ময়নামতি, কোটিলামুড়া, আনন্দ বিহার, ত্রিরত্ন স্তূপ, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড় ও ভাসুবিহার প্রসিদ্ধ। এসব তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণ করলে বৌদ্ধ নিদর্শনগুলোর সাথে পরিচয় ঘটে। এসব ঐতিহাসিক স্থানগুলো আমাদের অতীতের গৌরবের স্বাক্ষর বহন করে। আমাদের হারানো অতীত সম্পর্কে জানতে সহায়তা করে। তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করলে মনের প্রসারতা বাড়ে। বৌদ্ধধর্মের পুরাতন ইতিহাস ঐতিহ্যের স্মৃতিগুলো মনে জাগ্রত হয়। মনে হয় বুদ্ধের শিষ্য ও বৌদ্ধ রাজাদের অনেক কীর্তি এ স্থানগুলোতে লুকিয়ে আছে। এ সমস্ত স্থানের খনন কার্যের ফলে অনেক বৌদ্ধ স্তূপ, বিহার চেতা আবিষ্কৃত হয়েছে। আবিষ্কৃত বৌদ্ধ বিহার ও স্তূপগুলো একদিকে যেমন বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের সঠিক তথ্য সরবরাহ করে, অন্যদিকে দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধের সাধনা ও ধর্মপ্রচার কীভাবে বিরাট সভ্যতার সৃষ্টি করেছিল তার নিদর্শনও পাওয়া যায়। তাছাড়া বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ দেখা যায়।

তীর্থস্থান, মহাতীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব

তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শনের অনেক গুরুত্ব রয়েছে। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান ভ্রমণ করা একটি পুণ্যকর্ম। ধর্ম পালন করা যেমন কর্তব্য তেমনি এগুলো দর্শন করাও পবিত্র কর্তব্য। ধর্মপ্রাণ নরনারীগণ বিভিন্ন সময়ে এ সব দর্শনীয় স্থান ভ্রমণে যায়। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থান দর্শনে ধর্মের প্রতি আগ্রহ বাড়ে। এতে মন পবিত্র হয় এবং ধর্মে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। তীর্থস্থান ও মহাতীর্থস্থানে নানা দেশের লোক সমাগম হয়। তাঁদের সাথে মেলামেশার সুযোগ হয়। ফলে সকলের মধ্যে মৈত্রীভাব গড়ে উঠে। এগুলো দর্শনের ফলে মানুষের দুঃখ খণ্ডন ও অকুশল পরিহার করা হয়। পরকালের শান্তি ও সুগতি হয়। নিজের কল্যাণ ও সমৃদ্ধি লাভ হয়। তাই ঐতিহাসিক স্থান দর্শন করা উচিত। ঐ সব স্থান দর্শনে জ্ঞান

বাড়ে। ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানা যায়। এসব প্রসিদ্ধ ও গৌরবময় কীর্তি দর্শন করলে অতীত সম্পর্কে জানার আগ্রহ বাড়ে। মনে প্রসন্নতা ও ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত হয়। তাই প্রত্যেকের তীর্থস্থান, মহাতীর্থস্থান ও ঐতিহাসিক স্থানসমূহ দর্শন করা উচিত।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্বলাভ, প্রথম ধর্মপ্রচার ও মহাপরিনির্বাণ এই চারটি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুদ্ধ জীবনে চারটি মূল্যবান ঘটনা যে যে জায়গায় সংঘটিত হয়েছিল সে স্থানকে 'মহাতীর্থ' বলা হয়। মহাতীর্থ হচ্ছে তীর্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহাতীর্থ হলো লুম্বিনী, বুদ্ধগয়া, সারনাথ ও কুশীনগর।

এছাড়া বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য অনেক জায়গা ভ্রমণ করেন। তাঁর আদেশে শিষ্য ও প্রশিষ্যরা বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচার করেন। সে সব জায়গায় পরবর্তীতে ধীরে ধীরে নির্মিত হয়েছে সঙ্ঘারাম, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ। বুদ্ধের জীবনের অনেক ঘটনা কিংবা স্মৃতি এসব স্থানে পড়িয়ে আছে। এজন্য এসব স্থানকে বলা হয় 'তীর্থ'। যেমন– কপিলাবস্তু, মৃগদাব, শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী, গৃধ্রকূট পর্বত, কৌশাম্বী। অন্যদিকে বৌদ্ধদের নানা কৃষ্টি-ইতিহাস ঐতিহ্য সম্বলিত যে সকল স্থানসমূহ আছে তাকে বলে ঐতিহাসিক স্থান। এতে বুদ্ধ, বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য-নানা রাজন্যবগূ ও শ্রেষ্ঠীদের ঐতিহাসিক ঘটনাও জড়িত আছে। এতে বৌদ্ধদের নানা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শন বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান –

ক. শ্রাবস্তী খ.ময়নামতি

গ. কৌশম্বী ঘ. বৈশালী

২। কোনটি বৌদ্ধ তীর্থ?

ক. পহাড়পুর খ. ইলোরা

গ. তক্ষশীলা ঘ. বৈশালী

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ঘ

পাঠ-১৩.৩ লুম্বিনী

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- লুম্বিনী কোথায় অবস্থিত জানতে পারবেন।
- লুম্বিনীর বর্তমান নাম কী তা বলতে পারবেন।
- লুম্বিনীর ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	মহাতীর্থ, রুম্মনদেই, অশোকস্তম্ভ, উৎকীর্ণলিপি, বোধিবৃক্ষ।

চার মহাতীর্থের মধ্যে লুম্বিনী প্রথম মহাতীর্থ। লুম্বিনী গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। নেপালের দক্ষিণ সীমান্তের অন্তর্গত বুটন জেলার ভগবানপুর তহশিলের উত্তরে 'রুম্মিনদেই' নামক স্থানে অবস্থিত। শুদ্ধোদনের স্ত্রী রানি মহামায়া শ্বশুর বাড়ি থেকে পিত্রালয়ে যাবার পথে লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। রাজপুত্রের জন্মের কারণে লুম্বিনীর পরিচিতি বৃদ্ধি পায় এবং এটি 'মহাতীর্থ' হিসেবে বিখ্যাত হয়। বর্তমানে লুম্বিনীতে আগের মতো বাগান নেই। বুদ্ধজীবনের অনেক স্মৃতি রয়েছে। দেশ-বিদেশের বৌদ্ধরা স্থানটি দর্শন করে পুণ্য অর্জন করে। লুম্বিনী মন্দিরের পাশেই আছে একটি অশোকস্তম্ভ। ছোট ঢিবির উপর এই মন্দির। সিঁড়ি বেয়ে সেখানে উঠতে হয়। পুরণো মন্দিরের ভিত্তির উপর সেটি নেপাল সরকার আবার নির্মাণ করেন। এর উত্তরদিকে দরজা আছে। ভিতরে সিদ্ধার্থের জন্মচিত্র আকা একটি অখণ্ড প্রস্তর ফলক আছে। প্রস্তর ফলকটি সেই প্রাচীনকাল থেকে এখনও টিকে আছে। সিদ্ধার্থের জননী মহামায়াদেবী ডান হাতে শালগাছের শাখা ধরে আছেন এমন চিত্র ফলকও আছে। পাশে অন্যটি মহিলা গৌতমীর মূর্তি বলে মনে করা হয়। আর এক পাশে কয়েকটি মূর্তি করজোরে দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদেরকে ব্রহ্মা, দেবতা প্রভৃতি মনে করা হয়। সামনের দিকে একটি পদ্মফুলের উপর নবজাত সিদ্ধার্থ দাঁড়িয়ে আছেন। এ সমস্ত দৃশ্য বা চিত্রফলক দেখতে অপূর্ব লাগে। লুম্বিনী মন্দিরের দক্ষিণ পাশে যে পুষ্করিণীটি দেখা যায়, সেটি হচ্ছে লুম্বিনী পুস্করিনী। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের পরেই লুম্বিনী উপবনে নাগরাজ নন্দ উপানন্দ কর্তৃক জলধারায় যে স্থানে নবজাত শিশু সিদ্ধার্থের স্নানকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন, সেটি পরে একটি কূপে পরিণত হয়। তার দক্ষিণে আরও একটি স্তূপ ছিল যে স্থানে দেবরাজ ইন্দ্র নবজাত শিশু সিদ্ধার্থকে স্বীয় ক্রোড়ে তুলে নিয়েছিলেন এবং দিব্য বস্ত্র দ্বারা অলংকৃত করেছিলেন। এরই পাশে ছিল আরো চারটি স্তূপ, যেখানে চারজন লোকপাল দেবতা সিদ্ধার্থ গৌতমকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন।

স্তম্ভে উৎকীর্ণ লিপি পাঠে জানা যায়, এখানেই সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয় এবং মহারাজ অশোক এ স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন তাঁর রাজত্বের বিংশতিতম বর্ষে। এখানকার প্রধান দর্শনীয় বস্তু হল অশোক স্তম্ভ ও রুম্মিনদেই মন্দির। সম্রাট অশোক তাঁর রাজ্য অভিষেকের ২০ বছরে দ্বিতীয়বার লুম্বিনী আগমন করেন। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০ অব্দে তিনি সিদ্ধার্থের জন্মস্থানকে চিরস্মরণীয় ও চিহ্নিত করার জন্য একটি স্তম্ভ স্থাপন করেন। তার নামই অশোক স্তম্ভ। এতে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মস্থান চিরকালের জন্য চিহ্নিত হয়ে যায়। মন্দিরের প্রাঙ্গন থেকে অশোকস্তম্ভের দিকে যাওয়ার সিঁড়ি আছে। তার পূর্বদিকে যাওয়ার সিঁড়িও রয়েছে। তারই পাশে একটি বোধিবৃক্ষ আছে। প্রতিবছর তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা দেশ থেকে দলবেধে তীর্থযাত্রী যায় এবং লুম্বিনীর এ মন্দিরে পূজা করেন। শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

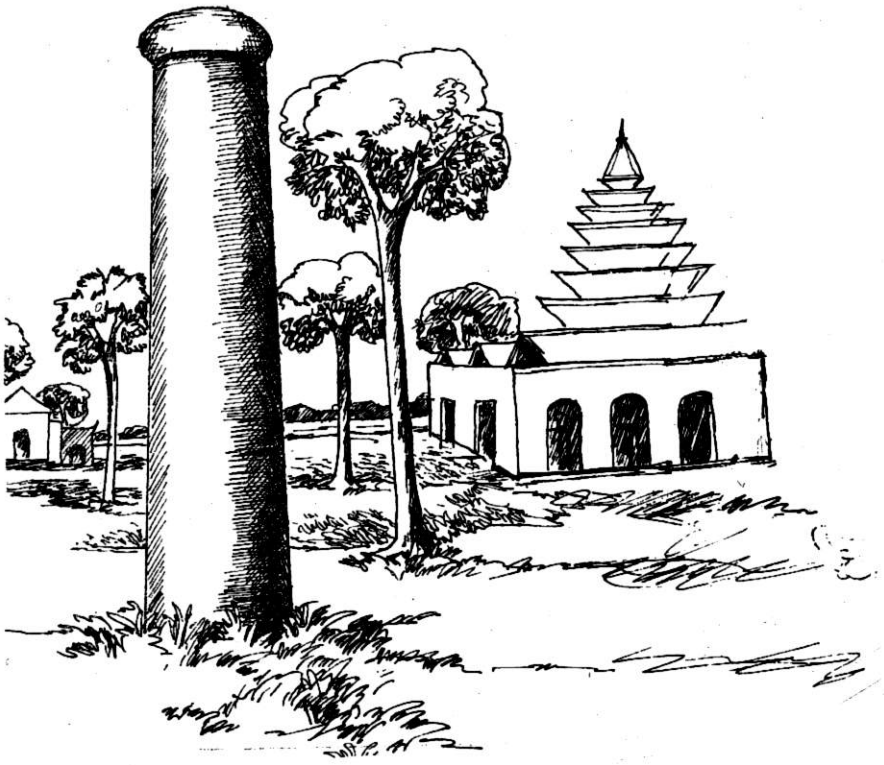

অশোক স্তম্ভ, লুম্বিনী

সারসংক্ষেপ :

চার মহাতীর্থের মধ্যে লুম্বিনী প্রথম মহাতীর্থ। লুম্বিনী গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। শুদ্ধোদনের স্ত্রী রানি মহামায়া শ্বশুর বাড়ি থেকে পিত্রালয়ে যাবার পথে লুম্বিনী কাননে সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্ম হয়। রাজপুত্রের জন্মের কারণে লুম্বিনীর পরিচিতি বৃদ্ধি পায় এবং এটি 'মহাতীর্থ' হিসেবে বিখ্যাত হয়। লুম্বিনী মন্দিরের পাশেই আছে একটি অশোকস্তম্ভ। সিদ্ধার্থের জননী মহামায়াদেবী ডান হাতে শালগাছের শাখা ধরে আছেন এমন চিত্র ফলকও আছে। কথিত আছে, সিদ্ধার্থ গৌতমের জন্মের পরেই লুম্বিনী উপবনে নাগরাজ নন্দ উপানন্দ কর্তৃক জলধারায় যে স্থানে নবজাত শিশু সিদ্ধার্থের স্নানকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন, সেটি পরে একটি কূপে পরিণত হয়। সম্রাট অশোক দু'বার লুম্বিনী ভ্রমণ করেছিলেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। লুম্বিনী কোথায় অবস্থিত?

ক. নেপালে খ. ভূটানে

গ. মগধে ঘ. কোশলে

২। সিদ্ধার্থের জন্ম হয়–

i. উদ্যানে ii. লুম্বিনী কাননে

iii. ইলোরায়

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. iiও iii

গ. ii ঘ. i ও iii

উত্তরমালা : ১. ক, ২. গ

পাঠ-১৩.৪ বুদ্ধগয়া

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নৈরঞ্জনা নদীর বর্তমান নাম কী তা জানতে পারবেন।
- মুচলিন্দ হ্রদ লিখতে জানতে পারবেন।
- বুদ্ধগয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বুদ্ধগয়া, বুদ্ধের পদচিহ্ন, বোধিবৃক্ষ, মহাবোধি মন্দির, বজ্রাসন, অবলোকিতেশ্বর, পদ্মপানির মূর্তি, সপ্ত মহাস্থান।

'বুদ্ধগয়া' হচ্ছে চার মহাতীর্থের একটি শ্রেষ্ঠ 'তীর্থ'। এটি অন্যতম মহাতীর্থ। যার প্রাচীন নাম ছিল উরুবেলা বা উরুবিল্ব। সিদ্ধার্থ গৌতম এখানে বোধিবৃক্ষের নিচে বসে সাধনার মাধ্যমে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি বুদ্ধ বা গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত। তাই বুদ্ধগয়া জগতের বৌদ্ধদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র ও পুণ্যময় স্থান। বুদ্ধগয়া ভারতের বিহার রাজ্যে অবস্থিত। গয়া রেলস্টেশন থেকে ১১ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে। স্টেশন থেকে যে রাস্তাটি গিয়েছে সেটি প্রাচীন নৈরঞ্জনা নদীর কূল বেয়ে গেছে এবং সে নদীর বর্তমান নাম ফল্গু নদী। বুদ্ধগয়ার প্রধান আকর্ষণ হলো বিশাল সুউচ্চ চারকোণা বুদ্ধমন্দির এবং মন্দিরের গা ঘেঁষে বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধের বজ্রাসন। এ বোধিবৃক্ষ এক ঐতিহাসিক বৃক্ষ। কারণ এ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে সিদ্ধার্থ মারকে পরাজিত করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। এ বৃক্ষমূলে যে বজ্রাসন আছে সে আসনে বসেই সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। সপ্তম শতকে হিউয়েন সাং ভারত পরিভ্রমণ করতে এসে বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসন দেখতে পান। এ বজ্রাসন একটি অখণ্ড পাথরে নির্মিত বলে বর্ণিত। আর এ বোধিবৃক্ষের ছত্রছায়ায় সিদ্ধার্থ গৌতম পরমার্থ জ্ঞান বা সর্বজ্ঞতা লাভ করেছিলেন বলে প্রত্যেক বৌদ্ধরা এ উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভরে বন্দনা জানায়।

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যে সমস্ত স্মৃতিসৌধ আছে তার মধ্যে বুদ্ধগয়ার এ মহাবোধি মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। সম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম এটা বড় করে নির্মাণ করেছিলেন। বিশ্বের ইতিহাসে বুদ্ধগয়ার এ মহাবোধি মন্দির এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। কারণ, সিংহল, মায়ানমার, শ্যাম, তিব্বত, নেপাল ও কম্বোডিয়ায় এই মন্দিরের অনুকরণে অনেক মন্দির নির্মিত হয়েছে। বুদ্ধগয়ার চারপাশে ছোট বড় বহু স্তূপ, স্তম্ভ, স্মৃতিসৌধ, উঁচু তোরণ, বুদ্ধের পদচিহ্ন মন্দিরের শোভা বৃদ্ধি করেছে। বোধিবৃক্ষের পশ্চিম-উত্তর পাশে বুদ্ধের পদচিহ্ন আঁকা পাথর আছে। মন্দিরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর আছে। বুদ্ধগয়ার মূল মন্দিরে আছে উপবিষ্ট বড় বুদ্ধমূর্তি। মূর্তির পরিধানের চীবর সুক্ষ্ম রেখা দ্বারা দেখানো হয়েছে। মূর্তিটি ১.৬৫ মিটার উপরে স্থাপিত। মূর্তিটির উচ্চতা ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২ ফুট ৪ ইঞ্চি, ৬ ফুট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি উচ্চতা। মন্দিরটি দ্বিতল বিশিষ্ট। মন্দিরের চার কোনায় চারটি ক্ষুদ্র মন্দির মূল মন্দিরের শোভা বর্ধন করছে। সম্মুখের দুই কোনায় দুটিতে উপরে উঠার সিঁড়ি আছে। সিঁড়িতে দু'টি বোধিসত্ত্ব পদ্মপানির মূর্তি এবং মূল মন্দিরের ভিতরে দণ্ডায়মান অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি আছে। মূর্তি দু'টি যেমন সুন্দর তেমন চিত্তাকর্ষক। এর শিরোভাগের দু'পাশে দু'টি ধর্মচক্র মূর্তি, মাঝখানে দু'দিকে দু'টি অভয়মুদ্রায় স্থিত বুদ্ধমূর্তি এবং পদপ্রান্তের দু'পাশে দু'টি দেবমূর্তি অঙ্কিত আছে।

মন্দিরের চারদিকে পাথরের প্রাচীর আছে। আগে এই প্রাচীরের ১২৪ টি স্তম্ভ ছিল। তার মধ্যে এখন মোট ৯০টি স্তম্ভ পাওয়া যায়। প্রাচীরের গায়ে গৌতম বুদ্ধের জীবনের বহু ঘটনা ও জাতকের কাহিনী অঙ্কিত আছে। বুদ্ধগয়ার মন্দিরের অদূরে

মুচলিন্দ হ্রদ আছে। সেখানে নাগরাজ মুচলিন্দ থাকতেন এবং বুদ্ধকে তিনি ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে সাত দিন রক্ষা করেছিলেন। বুদ্ধগয়ার মূল মন্দিরে ঢোকার সময় বাঁদিকে নিচু পাঁচটি কক্ষ আছে। কক্ষগুলোতে পাঁচটি একই রকম বুদ্ধমূর্তি আছে।

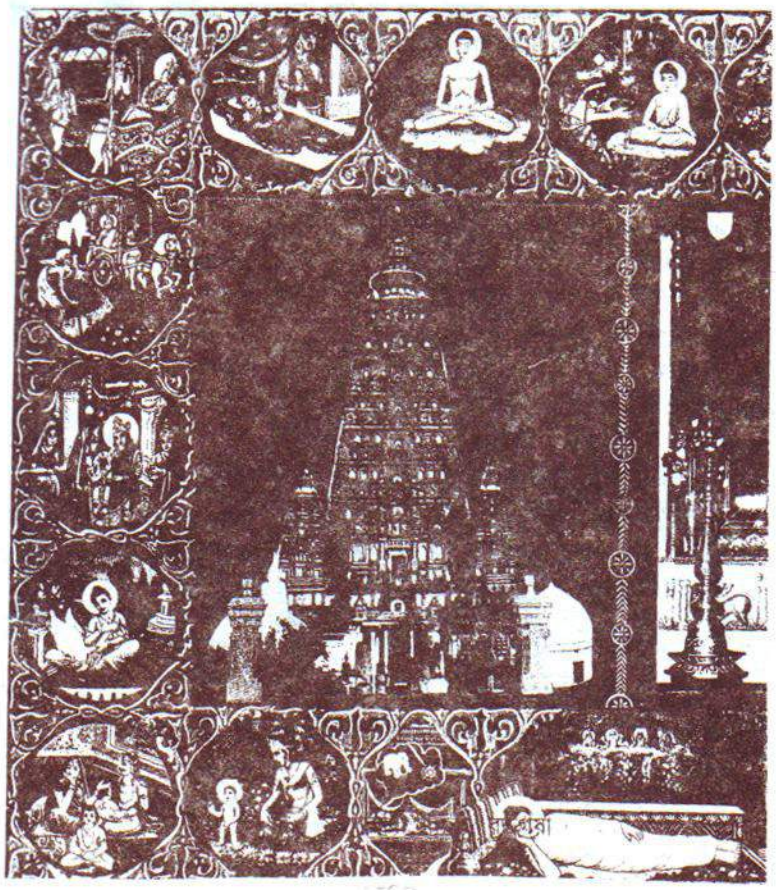

বুদ্ধগয়া

বুদ্ধগয়ার মূল মন্দিরের আশে পাশে আরো অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থান রয়েছে। সে প্রসিদ্ধ স্থানগুলো হচ্ছে-অনিমেষ চৈত্য, মুচলিন্দ হ্রদ, রাজায়তন বৃক্ষ, চংক্রমণ কুটী, রতনঘর ও অজপাল ন্যগ্রোধ। অনিমেষচৈত্য মূলমন্দিরের উত্তরপূর্ব কোণে একটি অনুচ্চ টিলার উপর মূলমন্দিরের নির্মিত ছোট মন্দির। বোধিলাভের দ্বিতীয় সপ্তাহ বুদ্ধ এ স্থানেই অতিবাহিত করেন। মূলমন্দিরের উত্তর পাশে ৩ ফুট উচু এবং ৬ ফুট দীর্ঘ চত্বও যুক্ত একটি স্থান আছে। তার পাশেই নিচের সমতল ভূমিতে ১৯ পদ্মচিহ্নিত অঙ্কিত স্থম্ভ আছে। এগুলো একেকটি পদচিহ্নের প্রতীক। কথিত আছে বোধিলাভের পর বুদ্ধ এ স্থানেই তৃতীয় চংক্রমন বা পদচারণা করেন। তাই এটি চংক্রমণ কুটি নামে পরিচিত। মূলমন্দিরের উত্তর-পশ্চিমকোণে অর্ধভঙ্গ একটি মন্দির আছে। বোধিলাভের ও চতুর্থ সপ্তাহটি এ স্থানে কার্যকারণনীতি ব্যাখ্যা করে অতিবাহিত করেন। তাই রত্নঘর নামেই অভিহিত। মূলমন্দিরের প্রবেশ পথেই অজপাল বৃক্ষের স্থানটি অবস্থিত। বোধিলাভের পর বুদ্ধ পঞ্চম সপ্তাহ এ স্থানেই অতিবাহিত করেন। মূলমন্দিরের দক্ষিণে একটি হ্রদ বা পুষ্করিণী রয়েছে। বোধিজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধ ষষ্ঠ সপ্তাহটি এস্থানে বসেই অতিবাহিত করেন। বোধিদ্রুমসহ এগুলোকে সপ্ত মহাস্থান বলে। শ্রদ্ধাবান বৌদ্ধরা এই সপ্ত মহাস্থানের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা ও বন্দনা নিবেদন করেন এ ভাবে–

পঠমং বোধি পালঙ্কং, দুতিযং অনিমিসম্পি চ,
ততিযং চঙ্কমণ সেট্ঠং, চতুত্থং রতনঘরং।
পঞ্চমং অজপালঞ্চ, মুচলিন্দঞ্চ ছট্ঠমং,

সত্তমং রাজাযতনং, বন্দেতং বোধিপাদপং।
প্রথম বোধিপালঙ্ক, দ্বিতীয় অনিমেষ চৈত্য, তৃতীয় চংক্রমণ চৈত্য, চতুর্থ রতনঘর চৈত্য, পঞ্চম অজপাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষ, ষষ্ঠ মুচলিন্দ মূল, সপ্তম রাজায়তন বৃক্ষ-এই সপ্ত মহাস্থানকে আমি অবনত শিরে বন্দনা জানাচ্ছি।

সম্রাট অশোকের কন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা এ বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ শাখা নিয়ে গিয়ে সিংহলের অনুরাধাপুরে রোপন করেছিলেন। সাঁচীর মূল স্তূপের পূর্ব তোরণে এ দৃশ্যটি খুব সুন্দরভাবে অঙ্কিত আছে। বুদ্ধের সময়েও আনন্দ স্থবির এর একটি শাখা নিয়ে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে রোপন করেছিলেন। শ্রাবস্তীর ঐ বোধিবৃক্ষটি এখনো আনন্দবোধি নামে পরিচিত। সম্রাট অশোকের শিলালিপি থেকে জানা যায়, তিনি মন্ত্রীগণসহ তাঁর রাজত্বের দশম বর্ষে এখানে এসেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং ভারতবর্ষের বুদ্ধগয়ায় এসেছিলেন। তিনি তখন বজ্রাসনটি বোধিবৃক্ষের নিচে দেখতে পান। মহাবোধি বিহারের অদূরে একটি জাদুঘর আছে। সেখানে বুদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। পৃথিবীর সকল বৌদ্ধদের জন্য এটি একটি পুণ্যময় মহাতীর্থস্থান।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধগয়া হচ্ছে চার মহাতীর্থের মধ্যে অন্যতম। সিদ্ধার্থ গৌতম এখানে বোধিতলে সাধনা করে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন। তখন থেকে তিনি বুদ্ধ বা গৌতমবুদ্ধ নামে পরিচিত। তাই বুদ্ধগয়া জগতের বৌদ্ধদের জন্য সবচেয়ে পবিত্র ও পুণ্যময় স্থান। বুদ্ধগয়ার প্রধান আকর্ষণ হলো বিশাল সুউচ্চ চারকোণা বুদ্ধমন্দির এবং মন্দিরের গা ঘেঁষে বোধিবৃক্ষ ও বুদ্ধের বজ্রাসন। এ বোধিবৃক্ষ এক ঐতিহাসিক বৃক্ষ। কারণ এ বোধিবৃক্ষের নিচে বসে সিদ্ধার্থ মারকে পরাজিত করে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। এ বৃক্ষমূলে যে বজ্রাসন আছে সে আসনে বসেই সিদ্ধার্থ গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে যে সমস্ত স্মৃতিসৌধ আছে তার মধ্যে বুদ্ধগয়ার এ মহাবোধি মন্দিরটি সবচেয়ে প্রাচীন। সম্রাট অশোকই সর্বপ্রথম এটা বড় করে নির্মাণ করেছিলেন। পৃথিবীর সকল বৌদ্ধদের জন্য এটি একটি পুণ্যময় মহাতীর্থস্থান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুদ্ধগয়া ভারতের কোন রাজ্যে অবস্থিত?

ক. পশ্চিমবঙ্গ খ. উত্তর প্রদেশ
গ. বিহার ঘ. মাদ্রাজ

২। দীপাঞ্জলী বড়ুয়া তীর্থভ্রমণে গিয়ে বুদ্ধগয়ার বোধিমূলে কিছুক্ষণ ধ্যানরত ছিলেন। ধ্যান থেকে উঠে সিদ্ধার্থ গৌতম বৃক্ষমূলে যে আসনে বসে বুদ্ধত্বলাভ করেছিলেন, সেটি দেখতে পেলেন। তিনি আসনটি শ্রদ্ধার সাথে এক নজরে দেখতে লাগলেন।

আসনটির নাম হচ্ছে–

i. দিব্যাসন ii. বজ্রাসন
iii. উচ্চাসন

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও iii

উত্তরমালা : ১. গ, ২. খ

পাঠ-১৩.৫ সারনাথ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সারনাথের অবস্থান সম্পর্কে বলতে পারবেন
- বুদ্ধের প্রথম ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।
- পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নাম জানতে পারবেন।
- সারনাথের গুরুত্ব তুলে ধরতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	ইতিপতন, মৃগদাব, পঞ্চবর্গীয় শিষ্য, গৌতমবুদ্ধের পবিত্র ধাতু রক্ষিত, চৌখণ্ডিস্তূপ, ধর্মচক্রমুদ্রা, প্রাচীন চৈত্য, অশোক অনুশাসন লিপি।

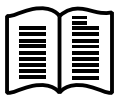

চার মহাতীর্থের একটি হচ্ছে সারনাথ। সারনাথের পূর্ব নাম ছিল ইসিপতন বা 'মৃগদাব'। গৌতম বুদ্ধ গয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভের পর জীবগণের মুক্তিলাভের জন্য প্রথম ধর্মপ্রচার করেন এই সারনাথে। সারনাথ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য স্থান। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসী থেকে প্রায় ৭ কিলোমটির দূরে বরুণা নদীর তীরে সারনাথ অবস্থিত। কথিত আছে, বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে এখানে সুবর্ণ মৃগ নামে মৃগদলের নেতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজাকে মৃগ হত্যাজনিত পাপের ফল থেকে রক্ষা করেন এবং সকল মৃগের জন্য অভয়বাণী লাভ করেন। এর নাম হয় মৃগদাব। বুদ্ধগয়ায় জ্ঞানলাভের পর গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম যে পাঁচ শিষ্যের কাছে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন তাঁদের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য বলে। তাঁদের নাম হচ্ছে কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। বুদ্ধ তাদের নিকট প্রথম যে সূত্র দেশনা করেছিলেন তা ধর্মচক্র প্রবর্তন নামে খ্যাত। বুদ্ধ এখানে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র ছাড়াও আদিচ্চ পরিযোসান সুত্ত, রথাভর সুত্ত, সচ্চবিভঙ্গ সুত্ত, পস সুত্ত, কুঠবিয সুত্ত প্রভৃতি আরও অনেক সূত্র দেশনা করেছিলেন।

পালি সাহিত্যের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ আছে-সারনাথ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্র ছিল। বুদ্ধ এখানে বারণসীর শ্রেষ্ঠপুত্র যশ ও তাঁর ৫০ জন বন্ধুসহ ৫১ জন, পঞ্চবর্গীয় শিষ্য ও আরো ৪ জন শিষ্য মিলে মোট ৬০ জন ভিক্ষু নিয়ে প্রথম ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এটাই প্রথম বিধিবদ্ধ সংঘ। বুদ্ধ এই ৬০জন ভিক্ষুকে বিভিন্ন দিকে ধর্ম প্রচারের জন্য পাঠান। পরে এখানে বহুশত ভিক্ষু বাস করতেন। পরবর্তীকালে সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন মহাকচ্চায়ন প্রমুখ মহাশ্রাবক বাস করতেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর সময় সারনাথের সঙ্ঘরাম আটভাগে বিভক্ত ছিল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরেই সারনাথ ধীরে ধীরে বৃহৎ সংঘরামে পরিণত হয়। অশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের অব্যবহিত পরেই সারনাথ পরিদর্শন করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের প্রথম ধর্মদেশনার স্থান চিহ্নিত করার জন্য এ স্থানে একটি সুবৃহৎ স্তম্ভ নির্মাণ করেন। স্তম্ভটি ৭০ ফুট উচ্চ এবং এর শীর্ষদেশ অত্যুজ্জল চুঁড়াবিশিষ্ট। সারনাথের মূল মন্দিরের স্থাপত্যশিল্প খুব সুন্দর। কাছেই মিগদাব চিহ্নিত স্থানে আছে হরিণের বন। এখানে এখন নির্ভয়ে হরিণ ঘুরে বেড়ায়। দশ একর জমি এই হরিণদের জন্য লোহার তার দিয়ে ঘেরা দেওয়া হয়েছে। সারনাথের অনেক বিহার ও মন্দির ধবংসস্তূপে পরিণত হয়। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সৌজন্যে খননকার্যের ফলে এ স্থানে বহু ধবংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। 'মৃগদাবরূপে চিহ্নিত স্থান থেকে আধা মাইল দূরে ধামেক স্তূপ অবস্থিত। এর উচ্চতা প্রায় ৪৬ মিটার। স্তূপের চারদিকে বাধানো চত্বর আছে। সম্ভবত: সম্রাট অশোক কর্তৃক এই সুবৃহৎ স্তূপটি নির্মিত হয়েছিল। এতেই বুদ্ধের দেহাবশেষ ধাতু আছে বলে জানা যায়। সারনাথের মূল মন্দিরে গৌতম বুদ্ধের পবিত্র ধাতু রক্ষিত আছে। প্রতিবছর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পবিত্র ধাতু তীর্থযাত্রীদের দেখার সুযোগ করে দেওয়া হয়। সারনাথের ধবংস স্তূপে বৌদ্ধযুগের আরও নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে। এখানে চৌখণ্ডি স্তূপ নামে একটি আটকোণা বিশিষ্ট

প্রাচীন চৈত্য আবিস্কৃত হয়েছে। আরও পাওয়া গিয়েছে সঙ্ঘভেদকারী ভিক্ষুদের শাস্তির বিধান উল্লেখ করে সম্রাট অশোকের একটি অনুশাসনলিপি। এছাড়া কুষাণ ও গুপ্ত যুগে নির্মিত বিহারের ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়েছে। এখানে ধর্মচক্র মুদ্রাযুক্ত উপবিষ্ট এক বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। এটি ধর্মচক্রমুদ্রার দ্বারা বুদ্ধের ধর্মপ্রচার স্থানকে সনাক্ত করেছে। এছাড়াও এখানে একটি বিশাল যাদুঘর আছে। প্রাচীন ধবংসস্তূপ ও চৈত্যসমূহ খনন করার সময় যেসব মূল্যবান সম্পদ পাওয়া গিয়েছে তা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে।

সারসংক্ষেপ :

চার মহাতীর্থের আর একটি হচ্ছে সারনাথ। সারনাথের পূর্ব নাম ছিল ইসিপতন বা 'মৃগদাব'। বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষমূলে বুদ্ধত্ব লাভ করার পর বুদ্ধ জীবগণের মুক্তিলাভের জন্য প্রথম ধর্ম প্রচার করেন এই সারনাথে। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের বারাণসী থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার দূরে বরুণা নদীর তীরে সারনাথ অবস্থিত। কথিত আছে, বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মে এখানে সুবর্ণ মৃগ নামে মৃগদলের নেতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধিজ্ঞান লাভের পর গৌতম বুদ্ধ সর্বপ্রথম যে পাঁচজন শিষ্যের কাছে 'ধর্মচক্র প্রবর্তন' সূত্র দেশনা করেন তাঁদের পঞ্চবর্গীয় শিষ্য বলে। তাঁদের নাম হচ্ছে কৌণ্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দীয়, মহানাম ও অশ্বজিৎ। জগতে তাঁরা প্রথম বৌদ্ধ বলে পরিচিত। এই সারনাথেই বুদ্ধ তাঁদেরকে প্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বুদ্ধ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের কোন 'পূর্ণিমায় ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র' দেশনা করেছিলেন?

ক. প্রবারণা পূর্ণিমা খ. ফাল্গুনী পূর্ণিমা
গ. বৈশাখী পূর্ণিমা ঘ. আষাঢ়ী পূর্ণিমা

২। সারনাথের পূর্ব নাম হচ্ছে–

i. তাপদাহ ii. অপদাহ
iii. মৃগদাব

নিচের কোনটি সঠিক

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i ও ii

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. গ

পাঠ-১৩.৬ পাহাড়পুর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সোমপুর বিহার সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সোমপুর বিহারে ভিক্ষুদের অবস্থান সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
- রাজা ধর্মপালের উদারতা সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	সোমপুর বিহার, রাজা ধর্মপাল, মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র, মধ্যমকর রত্নদ্বীপ, কল্যাণশ্রী মিত্র, বিশ্ব-ঐতিহ্য।

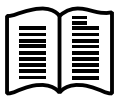

বৌদ্ধধর্ম এদেশের প্রাচীনতম ধর্ম। একসময় বৌদ্ধধর্ম এদেশের প্রধান ধর্ম ছিল। এখানে যে সমস্ত জায়গায় প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম চর্চা করা হত তন্মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম । পাহাড়পুর জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নওগাঁ জেলার একটি বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। এখানে সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ সংঘারামের ধ্বংস স্তূপ খুঁজে পাওয়া গেছে। আনুমানিক একাশি বিঘা জমিতে বিস্তৃত এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। সবগুলো ধ্বংসস্তূপ এখনো খনন করা হয় নি। কেন্দ্রিয় ধ্বংসস্তূপ পারিপার্শ্বিক সমতলভূমির চাইতে এত এত উঁচু যে স্থানীয় জনসাধারণ একে পাহাড় বলত। পরে প্রমাণিত হয়েছে এটা বৌদ্ধ সংঘারাম, তার বস্তুগত তথ্য পাওয়া গেছে এর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রাপ্ত অষ্টভুজি শিলালিপি থেকে। সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পাহাড়পুর এ দেশের বিখ্যাত নগরী হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। এ সময় পালরাজাগণ বঙ্গদেশ শাসন করতেন। পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। পালবংশের রাজা ধর্মপাল কর্তৃক সোমপুর বিহার নির্মিত হয়। পাহাড়পুরে একটি বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ বিখ্যাত 'সোমপুর বিহার' বলে প্রমাণিত। এটি দৈর্ঘ্যে ৯২২ ফুট এবং প্রস্থে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত ছিল। এতে দেওয়াল ঘেসে ভিক্ষুদের জন্য ১১৭টি কক্ষ ছিল। কথিত আছে, সে সময় পাহাড়পুরের সোমপুর বিহারের মত এত বড় বিহার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আর ছিল না। সম্ভবত এই পাহাড়পুর সোমপুর বিহারের অনুকরণেই ইন্দোনেশিয়ার বোরোবোদুর মন্দির নির্মিত হয়।

সোমপুর বিহারে মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র বাস করতেন। বোধিভদ্রের বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলার সূর্যসন্তান পণ্ডিত অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই বিহারে অবস্থান করেই ভাববিবেকের 'মধ্যমকর রত্নদ্বীপ' তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। দ্বাদশ শতকে উৎকীর্ণ (নালন্দায় প্রাপ্ত) শিলালিপি হতে জানা যায়, বিপুলশ্রী মিত্রের গুরু কল্যাণশ্রী মিত্র বঙ্গাল সৈন্য কর্তৃক এদেশ আক্রমণের সময় এ বিহারে অগ্নিদগ্ধ হন। বিমলশ্রী মিত্র তাঁর গুরুর বিহার পুনঃনির্মাণ করে দিয়েছিলেন। সোমপুর বিহারের বুদ্ধমূর্তির একটা সোনার আভরণও তিনি তৈরি করেছিলেন। রাজা ধর্মপালের উদারতা এবং বৌদ্ধধর্মে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মনে করে। ধর্মপাল সোমপুর বিহারকে কেন্দ্রিয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে রেখে আরও পঞ্চাশটি বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। এক সময় অযত্ন অবহেলায় এবং প্রাকৃতিক কারণে সোমপুর বিহার মাটির নিচে চাপা পড়ের যায়। সম্প্রতি জাতিসংঘ সোমপুর বিহারকে বিশ্ব-ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

সারসংক্ষেপ :

পাহাড়পুর বাংলাদেশের জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি নওগাঁ জেলার একটি বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। পালবংশের রাজা ধর্মপাল কর্তৃক সোমপুর বিহার নির্মিত হয়। সোমপুর বিহার দৈর্ঘ্যে ৯২২ ফুট এবং প্রস্থে ৯১৯ ফুট বিস্তৃত ছিল। এতে ভিক্ষুদের জন্য ১১৭টি কক্ষ ছিল। সোমপুর বিহারের অনুকরণেই ইন্দোনেশিয়ার বরোবোদুর মন্দির নির্মিত হয়। সোমপুর বিহারে মহাপণ্ডিত বোধিভদ্র বাস করতেন। বোধিভদ্রের বহু গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়েছে। বাংলার বিখ্যাত পণ্ডিত অতীশ দীপংকর শ্রীজ্ঞান এই বিহারে বাস করেই ভাববিবেকের 'মধ্যমকর রত্নদ্বীপ' তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। এটি একটি মহা ঐতিহাসিক স্থান যেটিকে জাতিসংঘ বিশ্ব-ঐতিহ্য হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পালবংশের কোন রাজা সোমপুর বিহার প্রতিষ্ঠা করেন?

ক. রাজা মহেন্দ্র পাল খ. রাজা দেবপাল

গ. রাজা ধর্মপাল ঘ. রাজা গোপাল

২। আমরা কয়েকজন মিলে পাহাড়পুর ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ ইতিহাস প্রসিদ্ধ সোমপুর বিহারের ভিতরের চারদিকে ঘুরে দেখেছি। প্রাচীন বিহারের ধ্বংসাবশেষ দেখে মুগ্ধ হয়েছি । এত বড় বিশাল বৌদ্ধবিহার বাংলাদেশের আর কোথাও ছিল না। সেই স্মৃতি এখনো মনে পড়ে।

পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন–

i. রাজা ধর্মপাল ii. রাজা দেবপাল

iii. রাজা গোপাল

নিম্নের কোনটি সঠিক

ক. i খ. i ও ii

গ. iii ঘ. ii ও iii

উত্তরমালা : ১. গ, ২. ক

পাঠ-১৩.৭ ময়নামতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ময়নামতির প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনের বর্ণনা করতে পারবেন।
- চন্দ্রবংশীয় রাজারা কত বছর রাজত্ব করেছিলেন জানতে পারবেন।
- ময়নামতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	শালবন বিহার, লোহিত মৃত্তিকা, চন্দ্রবংশীয় রাজা, কোটিল্য মুড়া, চারপত্র মুড়া, আনন্দ বিহার, শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

কুমিল্লা শহর থেকে ৪ মাইল দূরে ময়নামতি অবস্থিত। এক সময় ময়নামতি বৌদ্ধশাস্ত্র ও সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল। এ সময় চন্দ্র ও দেবরাজগণের শাসনকেন্দ্র ছিল ময়নামতি। লোহিত মৃত্তিকা নির্মিত এগার মাইল বিস্তৃত লালমাই পাহাড়ের উপর চন্দ্রদের প্রধান নগরী ময়নামতি অবস্থিত ছিল। দেববংশীয় রাজাদের সময় ময়নামতির নাম ছিল ময়নাবতী। এরপর দশম শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয়, রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের রাজধানী ছিল লালমাই পাহাড়। লালমাই-এর প্রাচীন নাম লোহিতগিরি। এখানে অনেক বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। রাজারা অনেক বিহার, স্তূপ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

কালক্রমে বিভিন্ন কারণে নগরী লুপ্ত হয়ে মাটি চাপা পড়ে যায়। বর্তমানে খনন কাজের ফলে সেসব প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়।এরমধ্যে শালবন বিহার, আনন্দ রাজার প্রাসাদ, রূপবান মুড়া, ভোজ রাজার প্রাসাদ, ইটাখোলা মুড়া, কুটিল মুড়া (ত্রিরত্ন স্তূপ) ইত্যাদি প্রধান।

শালবন বিহার

শালবনপুরের ধ্বংসাবশেষ খনন করে পাওয়া গেছে পাঁচশত পঞ্চাশ ফুটের বিশাল বৌদ্ধবিহার। পাশের বিশাল শালবন অনুযায়ী এর নামকরণ করা হয়েছে শালবন বিহার। বিহারের চার দেওয়ালে সঙ্গে সমান দূরত্বে ও সমান আকৃতির একশ পনেরটা ভিক্ষু আবাস রয়েছে। বিহারের চার কোণায় রয়েছে চারটা পরিদর্শন কক্ষ। উত্তর দিকে রয়েছে একমাত্র প্রবেশ দ্বার।

সঙ্ঘারামের কেন্দ্রে রয়েছে বুদ্ধ মন্দির। প্রত্যেকটা ভিক্ষু আবাসে বুদ্ধমূর্তি ছিল। কেন্দ্রের বুদ্ধ মন্দির অপূর্ব অলংকার খচিত ছিল। অষ্টম শতাব্দীর বাংলার বৌদ্ধ শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এই কারুকাজ।এসব শিল্পকলা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ শিল্পকলাকে প্রচুর প্রভাবিত করেছে।

শালবন বিহারে প্রাপ্ত দুটি তাম্র অনুশাসন ও অন্যান্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের বংশতালিকা ও রাজত্বকাল তৈরি করা হয়েছে। অবশ্য পূর্ণচন্দ্রের ও সুবর্ণচন্দ্রের রাজত্বকাল এখনও স্থির করা যায়নি । চন্দ্রবংশীয় রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। এই রাজবংশ ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম সহ বিশাল দক্ষিণ-পূর্ব বাংলাদেশ শাসন করেছেন একশত পঞ্চাশ বছর ।

কোটিল্য মুড়া

শালবন বিহারের তিন মাইল উত্তরে কৌটিল্য মুড়া। এখানে পাওয়া গেছে স্তূপ। উৎসর্গ ত্রিরত্নের প্রতীক হিসেবে তিনটা স্তূপ। প্রত্যেকটা স্তূপের চারধারে রয়েছে ছোট ছোট স্তূপ। এগুলো ব্যক্তিগত কেন্দ্রিয় স্তূপের ভিত্তি ধর্মচক্রের আকারে গঠিত। সর্বদক্ষিণের হল ঘর প্রার্থনা ও ভাবনার জন্য ব্যবহার করা হত। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি ছিল এখানে।

চারপত্র মুড়া

এখানে চারটা রাজকীয় অনুদানের তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাই এর নামকরণ করা হয়েছে চারপত্র। চারটি তাম্র রাজকীয় অনুশাসনই চন্দ্র রাজাদের। এখানকার প্রধান মন্দির পশ্চিম পার্শে। পূর্বদিকের হল ঘর থেকে প্রধান মন্দিরে যাওয়ার জন্য আচ্ছাদিত পথ রয়েছে। মূল হল ঘরের ছাদ ছিল চারটা স্তম্ভের ওপর।

আনন্দ বিহার

আনন্দ রাজ প্রাসাদ নামে পরিচিত ধ্বংসস্তূপ খনন করে পাওয়া গেছে মন্দির। অতি সম্প্রতি বিশাল অষ্ট ধাতুর বুদ্ধমূর্তি বের করা হয়েছে। শালবন বা পাহারপুরের মত এর চারধারে ছিল প্রাকার (প্রাচীন)। প্রাকারের সঙ্গে ছিল ভিক্ষুদের আবাস। কেন্দ্রে ছিল বুদ্ধ মন্দির।

সপ্তম শতাব্দিতে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেলে দেব ও চন্দ্র রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল ।

কুটিল্যামুড়ার তিনটি স্তূপকে মনে করা হয় বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ-এ ত্রিরত্নের প্রতীক। চারপত্র মূড়ায় আনন্দ রাজার প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। প্রাসাদের সাথে একটি বিহার এবং বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের পদ্মপাণি মূর্তি আছে। রূপবান মুড়াতে বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রী ও পঞ্চধ্যানী বুদ্ধসহ বিরাট বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে। এছাড়াও ময়নামতি অঞ্চলে পাওয়া গেছে প্রাচীন কালের হাতিয়ার, তাম্রলিপি, মুদ্রা, অলংকার, ব্রোঞ্জের মূর্তি, পোড়ামাটির চিত্রফলক ও অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। প্রাপ্ত এসব জিনিস শালবন বিহারের পাশে প্রতিষ্ঠিত যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সারসংক্ষেপ :

কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে ময়নামতি অবস্থিত। প্রাচীনকালে এ অঞ্চল সমতট নামে খ্যাত ছিল। এ সময় চন্দ্র ও দেবরাজগণের শাসনকেন্দ্র ছিল। লোহিত মৃত্তিকা নির্মিত দশ মাইল বিস্তৃত লালমাই পাহাড়ের উপর চন্দ্রদের প্রধান নগরী ময়নামতি অবস্থিত ছিল। দেববংশীয় রাজাদের সময় ময়নামতির নাম ছিল ময়নাবতী। এরপর দশম শতকে চন্দ্রবংশীয় রাজারা এ অঞ্চলে রাজত্ব করতেন। তাঁরা সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ধারণা করা হয়, রাজা মানিক চন্দ্রের রানি ছিলেন ময়নামতি। অষ্টম শতকে দেববংশীয় রাজা ভবদেবের আমলে ঐতিহাসিক শালবন বিহার নির্মিত হয়। শালবন বিহারের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান অর্থাৎ ৫৫০ ফুট ৫৫০ ফুট। এটি একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান সেখানে বহুমূল্যবান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ময়নামতি প্রধান চৈত্যের চারপাশে কয়টি কক্ষ ছিল?

ক. ১০০টি খ. ১০৫টি

গ. ১১০টি ঘ. ১১৫টি

২। দেববংশীয় রাজাদের সময় ময়নমতির নাম ছিল–

i. অরুণাবতী ii. ময়নাবতী
iii. কঙ্খাবতী
নিচের কোনটি সঠিক
ক. ii খ. iii
গ. i ঘ. i ও iii

৩। শালবন বিহারের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ-
i. দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান ii. গোলাকার
iii. ভিক্ষুকক্ষ রয়েছে
নিচের কোনটি সঠিক
ক. ii খ. iii
গ. i ঘ. i ও iii

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. ক, ৩. গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

বৌদ্ধ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা এক সেমিনারের আয়োজন করে। এই সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল মহাতীর্থ, তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থান। আলোচক বললেন– যে স্থানে বুদ্ধের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সংঘটিত হয় সেটাই মহাতীর্থ। বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের সব স্থানই হল তীর্থ। অন্যদিকে বৌদ্ধ ভাস্কর্য ও শিল্পকলার নিদর্শনই ঐতিহাসিক স্থান। সেই আলোচনায় সারনাথের গুরুত্ব ও দর্শনীয় বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থী প্রনবেশ বড়ুয়া ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্বের সাথে বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের সম্পর্ক অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

১. বুদ্ধ সর্বপ্রথম কতজন ভিক্ষুকে ধর্মপ্রচারের জন্য পাঠান?
২. সারনাথ পরিদর্শনের কারণ কি?
৩. উদ্দীপকের আলোকে উদাহরণসহ মহাতীর্থ, তীর্থ ও ঐতিহাসিক স্থানের মধ্যে পার্থক্য করুন।
৪. প্রণবেশ বড়ুয়া তীর্থ স্থানের গুরুত্ব কী বুঝলেন?

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা কুমিল্লার বৌদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান ময়নামতি দর্শনে যায়। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ময়নামতির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও দর্শনীয় বিষয়গুলো শিক্ষার্থীদের নিকট তুলে ধরেন। ঐতিহাসিক স্থান পরিদর্শনে দেশপ্রেম জাগ্রত হয়। শিক্ষার্থীদের আরো বুঝিয়ে দেন যে চন্দ্রবংশীয় রাজারা একত্রে ১৫০ বছর ধরে ঢাকা, কুমিল্লা, বরিশাল, চট্টগ্রামসহ বিশাল উত্তর-পূর্ববঙ্গ শাসন করেছিলেন। এতে শিক্ষার্থীরা দর্শনীয় স্থান, স্তূপ, বিহারের ধবংসাবশেষ, তাম্রলিপি প্রভৃতি দেখে ময়নামতির শিক্ষাণীয় বিষয় অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

ক. প্রাচীন কালে ময়নামতি অঞ্চল কী নামে খ্যাত ছিল?
খ. প্রাচীন স্থাপত্য-নিদর্শনের কয়েকটি উদাহরণ দাও।
গ. উদ্দীপক অনুযায়ী ঐতিহাসিক স্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. চন্দ্রবংশীয় রাজাগণের শাসন সম্পর্কে আলোচনা করুন।